Vol. 49 | No. 1 | 2011

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

মোহিতলাল মজুমদারের 'বুদ্ধ' : বিষয় ও প্রকরণ

Volume	49
Issue	1
Year	2011
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিমান চন্দ্র বড়ুয়া
Published online	October 1, 2011
DOI	10.62328/sp.v49i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i1.4
Pages	৬১-৮০
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মোহিতলাল মজুমদারের 'বুদ্ধ' : বিষয় ও প্রকরণ

বিমান চন্দ্র বড়ুয়া*

অহিংসার মূর্ত প্রতীক বুদ্ধ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক। পৃথিবীতে যে কজন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁরা অমৃতবাণী অভিসিঞ্চনে ভরিয়ে তুলেছেন মানবহৃদয়, তাঁদের মধ্যে বুদ্ধ অন্যতম। বহুমাত্রিক বিশ্লেষণে তাঁকে বিশ্লিষ্ট করা যায়। তাঁর প্রচারিত ধর্মমত-বিশ্বাস ও দর্শন আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে এনে দিয়েছে এক নবতর মাত্রা যা মোহিতলাল মজুমদারের (১৮৮৮-১৯৫২) কবিতায়ও লক্ষণীয়। মোহিতলার মজুমদারের *স্মর-গরল* (১৯২৮) কাব্যের অন্তর্গত 'বুদ্ধ' কবিতাটি এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এক্ষেত্রে 'বুদ্ধ' কবিতা রচনার মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে তাঁর কবি ও কবিপ্রকৃতির স্বকীয় ভাব ও ভাবনা। 'বুদ্ধ' কবিতা রচনার পরিকাঠামোতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্মের 'আদ্য-মধ্য-অন্ত'-এর ভাবগত পরিচয় তুলে ধরাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বাংলা কবিতার ক্রমোৎকর্ষের ইতিহাসে মোহিতলাল মজুমদারের কবিকৃতি অনস্বীকার্য। তিনি ছিলেন জীবনবাদী, আধুনিকোত্তম, জীবনরসিক, সুন্দরের উপাসক, সাহিত্যরসবেত্তা, মনস্বী ও সমালোচক। সর্বোপরি তিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যপুষ্ট বিবর্তনশীল যুগমানসেরই সর্বশেষ প্রতিভূ। রবীন্দ্রনাথের সর্বাতিশায়ী প্রবল প্রভাবের ক্ষণে যে কজন কবি জন্মগ্রহণ করে স্বতন্ত্র সরণিতে চলতে যথারীতি অভ্যস্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদারও একজন। তিনি ছিলেন সেই সময়ের এক আলোকময় জাগরণ। নিম্নের উক্তিটি তারই সত্যতা প্রমাণ করে —

> কবি মোহিতলাল বিশিষ্টজনদের মধ্যেও বিশেষ একজন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালে তাঁর অমোঘ প্রভাব এড়িয়ে গিয়ে নয়, আত্মসাৎ করে, বাংলাকাব্যে প্রথম স্বতন্ত্র নতুন স্বাদ যদি কেউ এনে থাকেন তাহলে তিনি কবি মোহিতলাল মজুমদার[১]।

মোহিতলাল মজুমদারের 'বুদ্ধ' কবিতাটি বুদ্ধ ও বৌদ্ধ বিষয়ক আদ্যন্ত সম্পূর্ণ বিশ্লেষণাত্মক দীর্ঘাকৃতি জীবনকাহিনী ও দর্শননির্ভর মূল্যবান একটি কবিতা। প্রাচ্যের মহামতি গৌতম বুদ্ধকে নিয়ে, তাঁর জীবনচেতনা মনন সম্পর্কে নানাভাবনা ও গভীরানুভূতি নিয়ে, মোহিতলাল 'বুদ্ধ' কবিতাটি রচনা করেন। কবিমানসের অন্তর্মূলে বৌদ্ধদর্শনের প্রতি সুস্পষ্ট অনুরাগ না থাকলেও কবির বুদ্ধবিষয়ক কবিতাটি এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। জীবনবাদী কবি বলেই ধ্রুব ও সত্যের অনির্বাণ মহাপুরুষ বুদ্ধকে নিয়ে তাঁর পক্ষে কবিতা রচনা করা সম্ভবপর হয়েছে। মোহিতলাল মজুমদারের এ কবিতা রচনার অন্যতম উৎস হিসেবে নিচের বক্তব্যটি বিবেচনাযোগ্য —

> কোন দিগ-দর্শনের জন্য তিনি বুদ্ধের দ্বারস্থ হননি। কেবল মাত্র মানুষের দুঃখের স্বরূপ ও কার্যকারণ সন্ধানে তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠা এবং নির্বাণের মধ্যে মুক্তি প্রয়াসের জন্য তিনি বুদ্ধ

*সহযোগী অধ্যাপক, পালি এণ্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> ব্যক্তিত্বের একান্ত অনুরাগী। উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনায় দেহকে পীড়ন করার ভূলপন্থা পরিহারের জন্যও তাঁর বুদ্ধ অনুরাগ আরো বৃদ্ধি পেয়েছে[২]।

'বুদ্ধ' কবিতায় বর্ণিত কাব্যের প্রায়োগিক স্বরূপ সম্পর্কে সমালোচকের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য—

> কবিতাটিতে ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের উদ্ভব-বিকাশ এবং পরিণামের ইতিহাসকে কবি আশ্চর্যজনকভাবে জীবনদর্শনের সঙ্গে মিলিয়ে কাব্যরূপ দিয়েছেন[৩]।

মোহিতলাল মজুমদার প্রত্যক্ষভাবে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে গভীর অনুরাগ প্রদর্শন না করলেও পরোক্ষভাবে তিনি কবিতা রচনার মাধ্যমে আড়াই হাজার বছরেরও পূর্বেকার মহাযশস্বী বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। কবিতাটির সাবলীল ভাব-ভাষা এবং রচনাশৈলী সবই মুগ্ধতার পরিচায়ক। সুতরাং বলা যায়, এ ধরনের মানসভূমি থেকেই জোতির্ময় বুদ্ধবিষয়ক কবিতার উৎপত্তি।

কবিতাটিতে প্রবেশের পূর্বে বুদ্ধ ও বৌদ্ধদর্শন বিষয়ে আলোচনার আবশ্যকতা রয়েছে। খ্রিষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বুদ্ধ নেপালের কপিলাবস্তুর[৪] লুম্বিনী উদ্যানে[৫] তদানীন্তন শাক্যরাজ্যের রাজা শুদ্ধোদনের ঔরসে রানী মহামায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল সিদ্ধার্থ। তিনি উনত্রিশ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে পয়ঁত্রিশ বছর বয়সে গয়ার বোধিদ্রুমমূলে পরম সম্বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন[৬]। বুদ্ধত্ব লাভ করার পর থেকে তিনি বুদ্ধ নামে পরিচিত হন। তারপর তিনি বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের মঙ্গল কিংবা কল্যাণের জন্য তাঁর ধর্মমত প্রচার করে আশি বছর বয়সে কুশীনারায় বা কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন[৭]। এখানে বুদ্ধ-প্রবর্তিত কয়েকটি দর্শন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হলো :

অনিত্য ও অনাত্মা : বৌদ্ধমতে, সংসার অনিত্য এবং অনাত্ম। এখানে 'অনিত্য' অর্থ সংসারে জীব এবং বস্তুগুলো নিত্য নয়। তারা ক্রমপরিবর্তনশীল ক্ষণস্থায়ী এবং বিনাশধর্মী। সংসার যদি অনিত্য হয় সেখানে সারবস্তু বলে কোনো কিছুরই অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই অনিত্য জীবদেহে নিত্য আত্মার অস্তিত্ব কল্পনা করা ভুল। নাম-রূপের[৮] সমষ্টিকে আত্মা বলে ধারণা করাও উচিত নয়। তাই সংসার যেমন অনিত্য তেমনি আবার অনাত্ম। অর্থাৎ বৌদ্ধমতে, সংসারে নিত্যবস্তুর ধারণা যেমন ভুল তেমনিভাবে আত্মার ধারণাও ভুল। সূত্রপিটকের সুপ্রসিদ্ধ 'ধর্মপদ' নামক গ্রন্থে এ বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে :

> সব্বে সঙ্খারা অনিচ্চাতি। অর্থাৎ সকল সংস্কার অনিত্য। (মার্গবর্গ/৫)
> সব্বে ধম্মা অনত্তাতি। অর্থাৎ সকল পদার্থ অনাত্ম। (মার্গবর্গ/৫)

দুঃখ : জন্ম মাত্রই দুঃখ। পৃথিবী দুঃখময়। দুঃখ ব্যতীত মানবজীবন কল্পনা করা যায় না। দুঃখ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বুদ্ধ বলেন : জন্ম দুঃখ, জরা দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, মৃত্যু দুঃখ, শোক দুঃখ, রোদন দুঃখ, পরিতাপ দুঃখ, অপ্রিয় সংযোগ দুঃখ, প্রিয় বিয়োগ দুঃখ, ঈপ্সিত বা অভিপ্রেত বস্তুর অলাভ দুঃখ, অনভিপ্রেত বস্তুর লাভ দুঃখ। সংক্ষেপে পঞ্চ উপাদান স্কন্ধই দুঃখ[৯]। বুদ্ধত্ব লাভের পরেই তাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হলো — 'দুক্‌খা জাতি পুনপ্পুনং'। অর্থাৎ সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ দুঃখ। (ধর্মপদ, জড়াবর্গ/১৫৩)

প্রতীত্যসমুৎপাদ : প্রতীত্যসমুৎপাদ[১০] নীতি বৌদ্ধদর্শনের মূলধারা। প্রতীত্যসমুৎপাদ অর্থাৎ কোনো বস্তুর প্রাপ্তিতে কিংবা বিদ্যমানে অন্য বস্তুর উৎপত্তি। এটি কার্যকারণ সম্বন্ধযুক্ত একটি বিশেষ প্রক্রিয়া। তারা পরস্পর চক্রাকারে সংযুক্ত হয়ে মানুষকে জন্ম হতে জন্মান্তরে আকর্ষণ করে। বৌদ্ধ পরিভাষায় কারণকে 'ভব' বলা হয়। এক হিসেবে যা 'কারণ' অন্য হিসেবে তাই 'কার্য' হয়ে দাঁড়ায় বলে বৌদ্ধদর্শনে এটাকে প্রতীত্যসমুৎপাদ নীতি বা কার্যকারণনীতি বলে অভিহিত করা হয়। উল্লিখিত দর্শন ছাড়াও তাঁর দর্শনে অনীশ্বরবাদ, ক্ষণিকবাদ, দুঃখমুক্তিবাদ, কল্যাণবাদ ইত্যাদি দার্শনিক তত্ত্ব রয়েছে।

পৃথিবীর ইতিহাসে বুদ্ধ মহাবোধসম্পন্ন সন্ন্যাসী। মানবমুক্তি এবং মানবের মহাকল্যাণ সাধনায় রাজপুত্র হয়েও ত্যাগ করেছিলেন রাজসিংহাসন লাভের অভিপ্রায়, গৃহধন, পরমা সুন্দরী স্ত্রী, প্রাণপ্রিয় শিশুপুত্র রাহুল, অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন এবং জীবনের যথাসর্বস্ব। কবি বুদ্ধ বিষয়ে এই ধরনের আখ্যানকে ব্যাখ্যা করছেন এভাবে :

জরা-মৃত্যু-বিভীষিকা, জীব-জন্ম, তাহার নিদান —
সেই ব্যাধি, মহাদুঃখ দূর করি' মানবে নির্ভয়
করেছিলে হে তাপস, পৃথিবীর প্রথম সন্ন্যাসী!
বিষের ঔষধ বিষ পিয়াইলে, ভিষক প্রধান!
ধরার পীড়িত জনে, — কামনার অঙ্কুশ দুর্জ্জয় —
ভাঙ্গিলে কৌশলে বীর, কামনার অঙ্কুর বিনাশি। (স্তবক – এক)

এখানে কবি বুদ্ধকে প্রথম সন্ন্যাসী[১১] বলে অভিহিত করেছেন। তিনি হয়ত মনে করেন, বুদ্ধই একমাত্র প্রথম সন্ন্যাসী যিনি রাজপুত্র হয়েও সাধারণভাবে জীবনযাপন করেছিলেন। জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং মস্তকমুণ্ডিত সন্ন্যাসীকে দেখে তাঁর মনে উপলব্ধি জাগল সংসারে কোনো মানুষই রোগ, ব্যাধি, জরা এবং মৃত্যু থেকে রক্ষা পায় না। তখন বুদ্ধ মানবের মহাদুঃখ দূর করার এক বিশেষ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। আর মুক্তিলাভের উপায় হিসেবে তিনি নিদানের[১২] ব্যাখ্যা করেছেন। কবি এখানে বুদ্ধকে শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হিসেবে অভিহিত করেন। কবির মতে, বুদ্ধই মানবচিত্ত থেকে দুঃখ নির্মূল করার এক বিশেষ এবং অভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। তাছাড়া 'বুদ্ধ' কবিতায় চিত্রকল্পে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের ছায়া আছে।

'দ্বিতীয় স্তবকে' কবি দেশে-বিদেশে অসংখ্য ধাতু ও শিলানির্মিত বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাখ্যা করেছেন। বুদ্ধমূর্তিগুলো বুদ্ধের পরমনিষ্ঠ ধ্যানমগ্ন ঋজুদেহ ভঙ্গিমায় সুগঠিত। সর্বোপরি সবকিছুকে ছাপিয়ে আছে হৃদয়োপলব্ধির অনিন্দ্যসুন্দর দীপ্তি —

হেরি মূর্ত্তি মঠে মঠে দেশে দেশে শিলা-ধাতুময়—
অধরে মূর্চ্ছিত হাসি, অবনত আঁখির পল্লবে
মুদিত উর্দ্ধগ দৃষ্টি, ঋজু দেহ, স্কন্ধ, গ্রীবামূল —
অনিন্দ্য আসন-ভঙ্গী! চিত্ততলে সে কি অসংশয়
জয়োল্লাস — জগতের মহাবৈরী-নিধন উৎসবে —!

সংসারে আকাঙ্ক্ষিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত নানা বিষয়ে দুঃখের উৎপত্তি হয়। দুঃখ যেন নিত্যদিনের সাথী। বুদ্ধ পঞ্চস্কন্ধের[১৩] সংক্ষিপ্তরূপকে দুঃখ বলে অভিহিত করেছেন। কবি

পৃথিবীতে অশান্তি-নৈরাজ্যের কথা বলেছেন। কবির বিশ্বাস, জগতের মহাবৈরী দুঃখকে নিঃসংশয়ে যিনি উৎপাটিত করতে পেরেছেন তিনি হলেন বুদ্ধ আর বুদ্ধমূর্তি তারই প্রতিভাস।

মোহিতলাল মজুমদারের 'বুদ্ধ' কবিতা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় বুদ্ধের মানবমুক্তির অভিব্যক্তি, দুঃখ জয়ের প্রেরণা এবং সত্যপথ অনুসরণের কথা। এই ধরনের পথ প্রদর্শনের জন্য আজো অসংখ্য মুক্তিকামী মানুষ, ভাবুক, সত্যের অন্বেষক বুদ্ধকে অকুণ্ঠচিত্তে ভক্তিসহকারে শ্রদ্ধা এবং অর্ঘ নিবেদন করে। তাই কবি উল্লেখ করেছেন :

> তার মুক্তি — সুখ নয়; জীব-জন্মে দুঃখ মর্ম্মান্তিক,
> তাহারি নিবৃত্তি শুধু — দূর করি' বাসনা-বিক্ষোভ। (স্তবক – চার)

কবি বৌদ্ধদর্শনের চারটি আর্যসত্যের[১৪] মধ্যে তৃতীয় আর্যসত্যের দার্শনিক দিকটি তুলে ধরেছেন। প্রতিটি কর্মেরই যেহেতু কারণ আছে সেহেতু পৃথিবীর সমস্ত দুঃখেরও কারণ রয়েছে। মূলত সেই কারণগুলো হলো অবিদ্যা কিংবা অজ্ঞতা (Ignorance), লোভ (Greed), দ্বেষ (Hatred), এবং মোহ (Delusion)। এগুলোর নিবৃত্তিকরণের মাধ্যমেই দুঃখের কারণগুলো বিদূরিত হয়।

বুদ্ধ মানবের সুপ্তপ্রতিভাকে জাগ্রত করে মন পবিত্রকরণের কথা বলেছেন, বলেছেন মনঃপ্রবৃত্তি থেকে কামনা-বাসনার লেলিহান অগ্নিশিখা নিষ্ক্রিয় করার কথা। তিনি স্নেহ-মায়া-মমতার বন্ধনকে পরাভূত করে সত্যানুসন্ধানীদের দুঃখ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই আহবানে সাড়া দিয়ে অগণিত নারী-পুরুষ ছুটে এসেছিলেন সারনাথে। মোহিতলাল মজুমদার এ বিষয়ে তাঁর নিজের অভিব্যক্তি কাব্যিকভাবে তুলে ধরেছেন :

> বিতরিল সারনাথে, তারপর আর্ত্ত নর-নারী —
> সকল আশার শেষ, মমতার সুচির নির্ব্বাণ,
> তৃষ্ণা, রতি, অরতির উচ্ছেদের পন্থা অনুত্তম
> লভিতে লভিতে ধেয়ে! — ত্রৈলোক্যের মুক্তির ভিখারী
> আপামর সর্ব্বজনে শান্তিবারি করিল প্রদান! (স্তবক – পাঁচ)

বুদ্ধের সময়ে শ্রেষ্ঠী ও রাজন্যবর্গরা বৌদ্ধধর্ম প্রচার-প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন যা কবিও গভীরভাবে তাঁর লেখনী দ্বারা তুলে ধরেছেন। যেমন :

> শ্রাবস্তির জেতবনে শ্রেষ্ঠী-শিষ্য কোটি কার্ষাপণ
> স্বর্ণমুদ্রা রাখি' ভূমে রচি দিল সৌধ সঙ্ঘারাম;
> মগধের রাজগৃহে মহারাজ সেন-বিম্বিসার
> পাদ্য-অর্ঘ্য দিয়া নিজে নিবেদিল বুদ্ধে 'বেণুবন';
> বৈসালির বেশ্যা মহাভিক্ষুপদে করিয়া প্রণাম
> কৃতার্থ হইল সঁপি 'আম্রবন' — বিপুল বিহার। (স্তবক – ছয়)

কবি একদিকে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা এবং অন্যদিকে সকলের নিকট এই ধর্মের গ্রহণযোগ্যতাকে আলাদা আলাদা করে দেখেছেন। তিনি বৌদ্ধ নির্মাণ-স্থাপত্যেশৈলীর

অপরূপ নিদর্শন শ্রাবস্তির উল্লেখ করেছেন। বুদ্ধের সময় স্বয়ংসম্পূর্ণ নগর ছিল শ্রাবস্তি। বৌদ্ধধর্মের উন্মেষলগ্নে 'জেতবন বিহার' নামক এক মহাবিহার ছিল। বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার পর উনত্রিশ বছর জেতবন বিহারেই অবস্থান করেছিলেন[১৫]। কবি মগধরাজ বিম্বিসার[১৬] এবং বহু রাজপুত্রের আকাঙ্ক্ষিত নারী আম্রপালির[১৭] নামও তিনি উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধধর্মের আলোচনায় তাঁদের উভয়ের নাম স্ব-স্ব মহিমায় উদ্ভাসিত। কবি তাদেরও স্মরণ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এখানে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

'বুদ্ধ' কবিতার সপ্তম স্তবকে দেখা যায়,

অশীতি-সহস্র মঠ নিরমিল নৃপতি অশোক
'বুদ্ধের শরণ' লাগি'; ভিক্ষুদের কাষায়-চীবর
পৃথ্বীরে করিল পাণ্ডু! প্রিয়দর্শী, দেবতার প্রিয়,
অরণ্যে গুহায় শৈলে স্তম্ভগাত্রে ধর্ম্মসূত্র-শ্লোক
প্রকৃতির-শাসন তরে লিখাইল,মহা-মহাশ্বীর —
রাজ-পুণে শ্রমণ গৌতম হ'ল বিশ্ব-বরণীয়!

এখানে বুদ্ধের ধর্মচর্চা প্রচার-প্রসারে সম্রাট অশোকের[১৮] আশি হাজার চৈত্যনির্মাণ এবং বুদ্ধের উপদেশগুলো দেশের বিভিন্ন স্থানে খোদিত এবং লিপিবদ্ধকরণের কথা ব্যাখ্যা করেছেন কবি।

মোহিতলাল মজুমদার 'বুদ্ধ' কবিতায় বহুবিচিত্র উপাদান ও ভাব-চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। তিনি বুদ্ধের জীবৎকালে মানুষরূপী দেবতার জীবনভোগ বাসনা এবং তাদের পূজিত হওয়ার ধারণা তুলে ধরেছেন।

মানুষ দেবতা হয়ে আরম্ভিল পৈশাচের ব্রত!
মন্দিরে, মঠের ভিতে, তোরণের স্তম্ভ-পীঠিকায়
উন্মদ মিথুন-মূর্ত্তি-যতী পূজে রতির চরণ! (অষ্টম স্তবক)

তাছাড়া 'নবম স্তবকে' কবি বোঝাতে চেয়েছেন 'দেহ রসাতলে' গেলেও বুদ্ধের মহিমাময় দীপ্তি সর্বত্র প্রকাশিত হয়েছে। 'দশম স্তবকে' কবি আবার ফিরে গেছেন গৌতম বুদ্ধের জন্মতিথি পবিত্র বৈশাখী পূর্ণিমায়। 'একাদশ স্তবকে' তিনি বুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেছেন এভাবে —

হেন পুত্র যার ঘরে, কি বা তার সুখ নাহি জানি,
কত সুখী তার প্রিয়া!' শুনি' সেই বাণী সকাতর,

'স্বপন-পসারী'র কবিতায় কবি মহামানবেরই বন্দনা করেছেন। মানুষের মধ্যে বল, বীর্য, প্রেম, করুণা, মুদিতা ও প্রজ্ঞার পরিচয়ের প্রকাশ ঘটে সেই অবস্থাকে কবি মহামানব নামে আখ্যায়িত করেছেন। মহামানবদের মধ্যে বুদ্ধ যুগে যুগে সার্থক ও সত্য হয়ে উঠেছেন। তাই কবি উল্লেখ করেন —

সৰ্ব্ব মানবে অভেদ করিয়া দেখিল যারা —
তা'রাই তোমায় দেখেছে প্রথম, জেনেছে তা'রা।
... ...
চিনেছি তোমারে, যুগে যুগে অবতীর্ণ তুমি!
হে বোধিসত্ত্ব! বুদ্ধ! তোমার চরণ চুমি!
(মহামানব/স্বপন-পসারী)

ব্যক্তি যশ-খ্যাতি এবং মহিমার গুরুত্বের কাছে পৃথিবীব্যাপী সত্যের অম্বেষক মানবমন সর্বদা মাথা নত করে। মোহিতলাল মজুমদারের ক্ষেত্রেও বিষয়টি ধারণাজাত সত্য বলে ধরে নেওয়া যায়।

পালি কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে বীর্যের[১৯] গুরুত্ব অপরিসীম। বুদ্ধ বীর্যের মাধ্যমে তেজোদীপ্ত শক্তি সঞ্চয় করে বুদ্ধত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। বীর্যশক্তিতে উজ্জীবিত এবং সাধনায় রত হয়ে তিনি সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন :

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং
ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু
অপ্রাপ্য বোধিং বহু কল্পং দূর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে[২০]।

অর্থাৎ এ আসনে আমার শরীর শুকিয়ে যাক; ত্বক, অস্থি, মাংস প্রলয় হোক। বহু কল্প দুর্লভ অপ্রাপ্য বোধি লাভ না করা পর্যন্ত আমি এ আসন ত্যাগ করব না।

বুদ্ধের দৃঢ় প্রতিজ্ঞাময় উচ্ছ্বাস বাণীকে মোহিতলাল প্রকাশ করেছেন এভাবে —

শীর্ণ হোক স্নায়ু-শিরা, রক্ত শুষ্ক, অস্থি ক্ষয় হোক,
এ আসন ত্যজিব না, না লভিয়া পূর্ণ পরা-জ্ঞান! (স্তবক তের)

প্রেম-স্নেহ, মায়া-মমতার বন্ধনকে হৃদয় থেকে উৎপাটিত করে সাধনায় সিদ্ধ হতে চেয়েছিলেন বুদ্ধ। কবি এটাকে পরিবার-পরিজন কিংবা আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসার অপমান বলে অভিহিত করেছেন :

প্রেমের লাঞ্ছনা সেই, মমতার সেই অপমান
জয়ী হ'ল! (স্তবক – তের)

'চৌদ্দ স্তবকে' এসে কবি বুদ্ধের জীবন সম্পর্কে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন এবং সেই উপলব্ধি কিংবা অনুভূতির ব্যাখ্যাও তিনি দিয়েছেন। কবি 'বুদ্ধ' কবিতায় দেখান, মানুষের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যুভাবনাকে দূর করার জন্যে বুদ্ধ প্রবৃত্তি-বিরোধী শূন্যতা সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মানুষ দুঃখ থেকে কীভাবে মুক্তি পেতে পারে বুদ্ধ তার উপদেশও দিয়েছেন। ত্রিপিটকের বিভিন্ন জায়গায় তার উল্লেখ রয়েছে। কবি এখানে বলতে চান যে, বুদ্ধ ব্যক্তিগত জীবনে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে[২১] দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর দুঃখ-যন্ত্রণাকে অবলুপ্ত করতে সক্ষম হননি। 'চৌদ্দ স্তবকে' কবি বুদ্ধকে নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন এভাবে — 'মার' কি মেনেছে বশ! ঘুচিয়াছে ধরিত্রীর ব্যথা? বৌদ্ধধর্মে সদ্ধর্মের

বিরুদ্ধশক্তিকে 'মার' বলা হয়। 'মার' বিভিন্ন সময় নানারকম ছলনায় বুদ্ধের বোধিলাভে বাধা সৃষ্টি করেছিলেন। কবি মনে করেন, বুদ্ধ কি 'মার'কে বশ করতে পেরেছেন? পেরেছেন কি ধরিত্রীর ব্যথা দূর করতে? 'মার'-এর শব্দগত অর্থ হলো, অসৎ ক্ষতিকর বা অশুভ বস্তু বা ব্যক্তি, অশুভ শক্তি, প্রলুব্ধকারী। কবির এ ধরনের প্রশ্ন কিন্তু প্রশ্নই রয়ে গেল। বুদ্ধ মারকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

'পনের স্তবকে' এসে বিশ্লেষণান্তে বুদ্ধের যশকীর্তির গুণগান এবং তাঁর অতিদীপ্ত রূপ স্মরণ করে কবি বলেন :

শুধু তুমি, ভূতসাক্ষী ভগবান শাক্য তথাগত!
মানস-মন্দিরে কভু দেখা দাও জগৎ-জনের।
তোমারি মহিমা স্মরি, স্মরি তব অমিতাভ-রূপ —
তোমারি উদ্দেশে মাথা শ্রদ্ধাভরে করি অবনত।

কবি এখানে বোঝাতে চেয়েছেন শাক্যবংশজাত বুদ্ধ এখনো মানসপটে বিরাজিত। মানবহৃদয়ে কিংবা মনমন্দিরে বুদ্ধেরই নাম ও প্রতিচ্ছবি এখনো উদিত হয়। অসংখ্য মানুষ সশ্রদ্ধচিত্তে এখনো তাঁকে স্মরণ করে। কীভাবে বুদ্ধের প্রভাবে দেশে-বিদেশে বৌদ্ধবিহার নির্মিত হলো তার একটি চমৎকার চিত্র এ কবিতায় রয়েছে।

বুদ্ধবিষয়ক কবিতায় মোহিতলাল মজুমদার বিভিন্ন স্তবকে বুদ্ধের নির্বাণতত্ত্বের অবতারণা করেছেন। যেমন — মমতার সুচির নির্ব্বাণ (স্তবক পাঁচ)। সত্য-সুখ বাসনা-নির্ব্বাণ (স্তবক বার)। পালি কিংবা বৌদ্ধ সাহিত্যে নির্বাণ বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে অনেক আলোচনা রয়েছে।

নির্বাণ শব্দের অর্থ 'নির্বাপণ'। এখানে নির্বাপণ বলতে অগ্নির নির্বাপণকে বোঝায়। রাগ-দ্বেষ-মোহ এগুলো 'অগ্নি'। *ধর্মপদ* নামক গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে : রাগের সমান অগ্নি নেই, দ্বেষের সমান গ্রাসকারী নেই, মোহের ন্যায় জাল নেই, তৃষ্ণার সমান নদী নেই[২২]। নির্বাণ শব্দ দ্বারা তৃষ্ণার ক্ষয় করাকে বোঝায়। *ধর্মপদ* গ্রন্থে আরো উল্লেখ আছে : যে ব্যক্তি ইহলোকে বর্ধনশীল দুর্দমনীয় তৃষ্ণাকে সংযম করতে পারেন পদ্মপত্র হতে জলবিন্দুর মতো তার শোকসমূহ দূরীভূত হয়[২৩]। নির্বাণ সম্বন্ধে *মিলিন্দ প্রশ্ন* নামক গ্রন্থে দেখা যায়, সকলেই নির্বাণ লাভ করে না। অথচ যিনি সম্যকরূপে ধর্মীয়ভাবে জীবনযাপন করেন, আচরিত ধর্মসমূহ জানেন, পরিপালন করেন, পরিজ্ঞাত ধর্মসমূহ পরিজ্ঞাত হন, পরিত্যাজ্য বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করেন, অনুশীলনীয় ধর্মসমূহ নিজের মধ্যে অনুশীলন করেন ও প্রত্যক্ষ করণীয় ধর্মসমূহকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেন, কেবল তিনিই নির্বাণ লাভ করতে পারেন[২৪]। নির্বাণ সম্পর্কে কবি মোহিতলাল মজুমদার এক কঠিন সত্য অনুধাবন করে নির্মম সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। বস্তুত এখানে কবির ধারণা, নির্বাণ লাভ করার পথ থেকে মানুষ সরে এসেছে। মানুষ নির্বাণ লাভ করার আশা ছেড়ে দেওয়ার ফলে নির্বাণ ধর্মই যেন শেষ হয়ে গেছে।

তবু সে নির্ব্বাণ ধর্ম্ম বহুদিন হয়েছে নির্ব্বাণ,
আছে শুধু ক্ষীণ-মর্ম্ম মৈত্রী আর অহিংসার নীতি! (স্তবক ষোল)

কবি বোঝাতে চেয়েছেন, নির্বাণ ধর্ম প্রখ্যাত হলেও বুদ্ধের মৈত্রী, মুদিতা, করুণা এবং উপেক্ষা এবং অহিংসা নীতি সকলের নিকট গ্রহণীয়। বুদ্ধের পুত-পবিত্র চরিত্র মহিমার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধ-প্রদর্শিত অসাধারণ জীবন-নীতি কিংবা মানব কল্যাণব্রতের পথটি কবির অনুমোদন লাভ করতে পারেনি। সমাজব্যবস্থায় যদি বুদ্ধের অহিংসা নীতি সত্যিই গৃহীত হতো তবে হানাহানি, মারামারি, বিদ্বেষভাবে জর্জরিত হতো না কেউ। বর্তমান সামাজিক অবক্ষয় রোধ এবং অশান্ত ধরণীতলকে একমাত্র স্নিগ্ধ শীতল করতে পারে বুদ্ধের মহামৈত্রী বা অহিংসা নীতি।

বুদ্ধগয়ার বোধিদ্রুমমূলে অবিরাম কঠোর সাধনার মাধ্যমে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর সেই বুদ্ধত্ব লাভের সাক্ষী একমাত্র তিনি নিজেই । মোহিতলাল মজুমদার বুদ্ধের অর্জিত পরমজ্ঞানের অভিজ্ঞতাকে স্বপ্ন বলে অভিহিত করেছেন —

বোধিদ্রুমতলে বসি' যেই স্বপ দেখিলে, সন্ন্যাসী,
তোমারি সে,— স্বপ্ন সত্য হোক, মিথ্যা হোক, তুমি দ্রষ্টা তাঁর;
বিশ্বজনে সেই স্বপ্ন দেখাবারে করিলে প্রয়াস — (স্তবক – সতের)

মোহিতলাল মজুমদার 'বুদ্ধ' কবিতাটির 'আঠার স্তবকে' বুদ্ধকে একজন ধর্মরাজ চক্রবর্তী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এখানে ধর্মরাজ চক্রবর্তী বলতে কবি বুদ্ধ কর্তৃক ধর্মের অনুশাসন প্রবর্তন করাকে বুঝিয়েছেন। অর্থাৎ কবি বুদ্ধকে ধর্মের রাজা বলতে দ্বিধাবোধ করেন। পার্থিব জীবনে সুখ ক্ষণিকের মরীচিকার ন্যায় আর দুঃখ যেন নিত্য দিনের সাথী। এমতাবস্থায় বুদ্ধ দুঃখমুক্তিকেই একমাত্র সত্য বলেছেন। বুদ্ধের সাধনার অন্যতম বিষয় দুঃখ নয়, দুঃখ থেকে মুক্তি। মোহিতলাল মজুমদারও জীবন যে দুঃখময় তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি দুঃখময় সংসারে সুখের ক্ষণিক ছোঁয়াকে 'তুষারে ফুল ফোটা' বলেছেন। এক্ষেত্রে কবিও পার্থিব জীবনে যে দুঃখ আছে সেই দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েছেন।

বৌদ্ধধর্ম দর্শনে বিশ্বাসীরা কখনো জন্ম-মৃত্যুর অধীনে থাকতে চায় না। অর্থাৎ প্রথাগত জীবনের প্রতি তাদের কোনোরকম আসক্তি নেই, তারা শুধু মুক্তি চায়। কিন্তু মোহিতলাল মজুমদারের জীবনদর্শন বিমুখতার বৈপরীত্যে মুখর। সংসারজীবন থেকে মুক্তি কামনা করে বৌদ্ধরা। পক্ষান্তরে, জীবনবাদী কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকেরা জীবন থেকে সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা সবকিছু যেন পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে আগ্রহী। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ থাকে যে, মোহিতলাল মজুমদার দুঃখকে একমাত্র দুঃখ বলেই অভিহিত করেছেন। তবে সুখের ক্ষণিকতাকেও তিনি অস্বীকার করেননি। ধারণা করা হয়, কবি এখানে দুঃখবাদকে স্বীকার করলেও কখনো দুঃখবাদী হতে চাননি। কবির মতে, সুখ-দুঃখের মিলিত ধারার নামই মানবজীবন। অত্যধিক কামনা-বাসনা, লোভ-দ্বেষ-মোহ মানবসমাজের জন্য শুভকর বিষয় নয়। মূলত এ রকমের চাহিদাই আবার তাদের আকাঙ্ক্ষিত স্থানে পৌঁছতে সহায়তা করে প্রতিনিয়ত। এ বিষয়ে কবি মোহিতলাল মজুমদার সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন —

আজ আর নাহি ভয়; দুঃখ সুখ দুয়েরি সমান
সাধক আমরা সবে, জানি জন্ম আর হেথা নাই —

স্বর্গলোভ করি না যে, নরকের নাহি যে নিশানা!
কৈশোর যৌবন জরা — জীবনের যতকিছু দান
আগ্রহে লুটিয়া লই, যাহা পাই অমূল্য যে তাই!
ভুলেছি আত্মার কথা, মানি শুধু দেহের সীমানা। (স্তবক – উনিশ)
... ... — তার সেই জীবন মরণ
ফুরাইবে ক্ষণপরে, কেন বৃথা করি হা-হুতাশ
আদি-অন্ত-ভাবনায়? — কেন ফিরি অদৃষ্ট সন্ধানে? (স্তবক – বিশ)
আছে কাঁটা ? হায়, সে যে বৃন্তমূল করেছে কঠিন —
মধুর মাধুরীটুকু বেদনায় করেছে দুর্লভ!
কীট ? — সে তো চিন্তা-শূল-মর্ম্মকোষে পরাগের ব্যাধি —
... ...
এত শোভা! তবু সে শিহরি' উঠে মৃত্যুভয়ে কাঁদি। (স্তবক – একুশ)

'বুদ্ধ' কবিতায় মোহিতলাল মজুমদার নিজেকে একজন বিদগ্ধ সমালোচক হিসেবে তুলে ধরেছেন। কবি এখানে বুদ্ধের মতো একজন মহাপুরুষের তত্ত্বগত-দার্শনিক দিক নিয়েও সমালোচনা করতে সামান্যতম কুণ্ঠাবোধ করেননি। তাঁর কবি ও সমালোচক সত্তা একীভূত বলেই তিনি নিজগুণে অনন্য।

কবিতার শেষ স্তবকে দেখা যায়, নারীর প্রেম এবং অসংখ্য আত্মীয়-স্বজনের ভালোবাসাকে অবহেলা করে সাধনার শেষ পর্যায়ে অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণকায় সন্ন্যাসী বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে বোধিবৃক্ষের নীচে সুজাতার পরিবেশিত সুস্বাদু পায়েসান্ন গ্রহণপূর্বক পরিতৃপ্ত লাভ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তখন বুদ্ধ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন আহার না করে সাধনার আরাধ্য বিষয় কখনো লাভ করা সম্ভব নয়। দেহ ও মন একে-অপরের পরিপূরক। সুস্থদেহ মানেই সুস্থ মন। দেহ সুস্থ থাকলেই মনে আসে প্রফুল্লতা ও প্রসন্নতা। এখানে সুস্থ মনের জন্য ইন্দ্রিয়গুলোকে সংযম করা দরকার। বুদ্ধ ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ সাধনাকে কবি তৈমুরের লক্ষ জীবননাশ অপেক্ষা ভয়াবহ মনে করেন। তাঁর বিশ্বাস, একমাত্র প্রেমই মানুষের সকল দুঃখ, সকল আশা এমনকি মৃত্যুর দুঃস্বপ্ন-ভীতি দূর করতে পারে। এই প্রেমের স্বরূপ সম্পর্কে কবির শেষ প্রত্যয় :

অমৃত-বল্লরী সে যে, সঞ্জীবনী বিস্মরণী সুধা! —
কামেরই সে ভিন্ন রূপ — নাম তার জানে বটে সবে;
প্রাণের রহস্য তবু এক সেই! — জন্মান্ত অবধি
তাহারি বিহনে কারো মিটে না যে মরণের ক্ষুধা! (স্তবক — বাইশ)

ঘুচিবে দুরূহ দুঃখ, মৃত্যুভয় রবে না যে আর!

বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ ধ্যানে বসি' রবে না সদাই;
সুজাতা আনিবে অন্ন, পূর্ণা-তিথি উঠিবে উজলি'—
'মার' দিবে হাসিমুখে হাতে তুলি' বাঁশীখানি তার! (স্তবক - তেইশ)

প্রত্যেক মহৎ কবির স্বতন্ত্র একটি রীতি থাকে। মোহিতলাল মজুমদারও সেইরূপ বিশিষ্ট রীতিসম্পন্ন একজন কবি। এখানে 'বুদ্ধ' কবিতাটি মোহিতলাল মজুমদার নিতান্তই নিজস্ব

রীতিতে রচনা করেছেন। তাঁর রীতি একদিকে কাব্যিক ভাষাশ্রিত, অন্যদিকে তা তাঁর ব্যক্তিত্ব সমুদ্ভাসিত। কবিতাটিতে কবির চিন্তা-চেতনা, মেধা-মননের স্বরূপও দেখা যায়। এতে ভাবগত ব্যাখ্যাও রয়েছে। কবিতাটি ব্যক্তি বন্দনার হলেও সমগ্র কবিতায় দেখা যায় ইতিহাসের উপাদান।

কবিতাটিকে পর্যায়ক্রমে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : 'প্রথম থেকে সপ্তম' পর্যন্ত স্তবকে দেখা যায় বুদ্ধের দেহের রূপ বা সৌন্দর্য বর্ণনা, বৌদ্ধধর্মের প্রচার, বুদ্ধের আবির্ভাবে রাজন্যবর্গের দীক্ষা গ্রহণ। 'অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ' স্তবকে দেখা যায়, পরবর্তীসময়ে কী করে বৌদ্ধধর্ম আত্মিক সমর্থন হারিয়েছে। তাছাড়া এ অংশে রয়েছে বুদ্ধজীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা, কামনা-বাসনা, মায়া-মমতা, ভোগ-বিলাস ত্যাগের মর্মস্পর্শী ঘটনাগুলো। 'চৌদ্দ থেকে তেইশ' স্তবকে রয়েছে মোহিতলাল মজুমদারের ইতিহাসের সত্যাবলম্বন ও যুক্তির মাধ্যমে বৌদ্ধ মতবাদকে যাচাই করার প্রেরণামূলক মানসিকতা।

বুদ্ধের জাগতিক বিষয়বস্তু কিংবা নানাবিধ চাহিদা বর্জন করার বিষয় মোহিতলাল মজুমদারের সমর্থন আদায় করতে পারেনি। এমতাবস্থায় 'বুদ্ধ' কবিতাটি সাধারণজনের জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহল নিরসন করবে আশা করা যায়। সবশেষে বলা যায়, প্রথাগত নয় বরং আধুনিক বস্তুবাদের নিরিখে, ঐতিহাসিক তথ্য-তত্ত্বের সমন্বয়ে, স্বীয় প্রজ্ঞালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে কবি যে সত্যকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন, তারই প্রকৃষ্ট ও বিশ্বস্ত প্রতিলিপি হয়ে উঠেছে এই সুদীর্ঘ 'বুদ্ধ' শিরোনামের কবিতা।

তথ্যনির্দেশ ও টীকা

১. প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত, *মোহিতলাল মজুমদারের সুনির্বাচিত কবিতা* (কলিকাতা : ১৮৮৩ শকাব্দ), পৃ. ক

২. জয়ন্ত বন্দোপধ্যায়, *কবিতার দর্পণ : মোহিতলাল মজুমদার* (কলকাতা : ১৯৯৮), পৃ. ৩৯

৩. ভবতোষ দত্ত, *মোহিতলাল মজুমদারের জীবন ও কবিতা* (কলকাতা : ১৯৯৭), পৃ. ২৯

৪. এটি রাজা শুদ্ধোদনের রাজধানী ছিল। শাক্যরা এখানে রাজত্ব করতেন। বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করলে শাক্যরা কুশীনারায় এসে বুদ্ধের দেহঅস্থির অষ্টমঅংশ নিয়ে এসে চৈত্য নির্মাণপূর্বক পূজা করেছিলেন।

৫. সম্রাট অশোক সিংহাসনে আরোহণের প্রায় দুদশক পরে (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৪৯) বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনী পরিদর্শনে আসেন। বুদ্ধ যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেখানে তিনি একটি স্তম্ভ নির্মাণ করেন।

৬. অশ্বঘোষ, *বুদ্ধ চরিতম্* (কলকাতা : ১৯৭৮), পৃ. ৮৮

৭. Sir Ediwn Arnold, *Light of Asia* (London: 1964), P.137

৮. নামরূপকে বিশ্লেষণ করলে পাঁচটি বিষয় পাওয়া যায়। যেমন :
রূপ : যার রূপ আছে কিংবা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রকাশ আছে তাই রূপ। সকল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু এই রূপের অন্তর্ভুক্ত হয়।
বেদনা : বেদনার শব্দগত অর্থ ইন্দ্রিয়ানুভূতি। বেদনার মাধ্যমে বস্তু সম্বন্ধে উপলব্ধি হয়।
সংজ্ঞা : ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানই সংজ্ঞা। ইংরেজি পরিভাষায় যাকে perception বলা হয়।
সংস্কার : ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি বলতে সংস্কার বোঝায়।
বিজ্ঞান : চেতনা বা মনকে বিজ্ঞান বোঝায়।

৯. ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘনিকায়* (কলিকাতা : ১৯৫৪), পৃ. ২৭০

১০. আচার্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, *বৌদ্ধ দর্শনে সত্যদর্শন* (কলকাতা : ১৩৯৫), পৃ. ৬৮-৭৫

১১. সন্ন্যাসী শব্দের কয়েকটির সমার্থক অর্থ হলো ক্রমান্বয়ে গৃহত্যাগী, সংসারত্যাগী ভিক্ষুধর্ম অবলম্বনকারী, বিরাগী, নিষ্কামপরায়ণ ইত্যাদি।

১২. নিদান : দুঃখ ও দুঃখ থেকে মুক্তিলাভের যে পথ তিনি আবিষ্কার করেছেন তা নিদান নামে অভিহিত। বুদ্ধ নির্দেশিত নিদানে বারোটি পর্যায়ের বর্ণনা রয়েছে। এগুলো হলো :
অবিদ্যা প্রত্যয়ে সংস্কার, সংস্কার প্রত্যয়ে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান প্রত্যয়ে নামরূপ, নামরূপ প্রত্যয়ে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন প্রত্যয়ে স্পর্শ, স্পর্শ প্রত্যয়ে বেদনা, বেদনা প্রত্যয়ে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা প্রত্যয়ে উপাদান, উপাদান প্রত্যয়ে ভব, ভব প্রত্যয়ে জন্ম আর জন্ম প্রত্যয়ে জরামরণ, শোক-পরিবেদন, দুঃখ-নিরাশা উৎপন্ন হয়।
[প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির অনূদিত, *মহাবর্গ* (কলিকাতা : ১৯৩৭), পৃ. ০১]

১৩. রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞানকে পঞ্চস্কন্ধ নামে অভিহিত করা হয়।

১৪. আর্যসত্য : বোধিলাভের সময় বুদ্ধ দুঃখ নিবৃত্তির পথ হিসেবে যে চারটি সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বৌদ্ধধর্মে তা চারি আর্যসত্য নামে পরিচিত। আর্যসত্যগুলো হলো নিম্নরূপ : ক. দুঃখ আছে, খ. দুঃখ উৎপত্তির কারণ আছে, গ. দুঃখ নিরোধ আছে এবং ঘ. দুঃখ নিরোধের উপায় আছে।
[ভিক্ষু শীলভদ্র অনূদিত, *দীর্ঘ নিকায়*, তৃতীয় খণ্ড (কলিকাতা : ১৩৬১), পৃ. ৪]

১৫. B. C Law, *Early Indian Monasteries* (Bangalore : 1985), P.8

১৬. বিম্বিসার : বিম্বিসার (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ৫৪৫-৪৯২) মগধের একজন প্রখ্যাত রাজা ছিলেন। মহান এই রাজার সহায়তায় ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং প্রসারতা লাভ করেছিল। এখানে উল্লেখ থাকে যে, তিনি ছিলেন বুদ্ধের সমসাময়িক।

১৭. আম্রপালি : বুদ্ধের সময়ে বৈশালীর অন্তর্গত রাজোদ্যানের আম্রবৃক্ষতলে আম্রপালি জন্মগ্রহণ করেন। তবে কোন আম্রবৃক্ষতলে তার জন্ম হয়েছে এ বিষয়ে কোনো নির্দেশনা নেই। নানাগুণে গুণান্বিত এবং অপরূপ সুন্দরী ছিলেন তিনি। তার রূপে মোহিত হয়ে রাজকুমাররা তাকে পাবার জন্য পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতো। এমনকি কলহ নিরসনে তারা আম্রপালিকে বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য করেছিলেন। আম্রপালি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে সমস্ত ধন-সম্পদ ত্যাগ করে বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত হয়ে মনের রিপুগুলোকে দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৮ অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩-২৩২ অব্দ); প্রাচীন ভারতে যে কজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম। পিতা বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর নিরানব্বই জন বৈমাত্রেয় ভাইকে হত্যা করে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। চণ্ডালের ন্যায় বৈমাত্রেয় ভাইদের হত্যা করেছেন বলে তাকে চণ্ডাশোকও বলা হতো। পরবর্তীসময়ে তিনি বৌদ্ধধর্মের অনুসারী হয়ে জনকল্যাণকর কর্ম সম্পাদন করার ফলে ধর্মাশোক নামেও পরিচিতি লাভ করেন। অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসংগীতি অনুষ্ঠিত হয় যেখানে *ত্রিপিটক* পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে। তৃতীয় সংগীতির মাধ্যমে তিনি পৃথিবী ও বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য ধর্মদূত প্রেরণ করেন।

১৯. বীর্য : 'বীর্য' শব্দের শব্দগত অর্থ হলো সক্রিয়শক্তি, প্রাণশক্তি, জীবনীশক্তি, বলিষ্ঠতা, কর্মশক্তি, কঠোর প্রচেষ্টা ইত্যাদি। [*পালি-বাংলা অভিধান*, শীলরত্ন ভিক্ষু, (ঢাকা : ২০০২), পৃ. ২২৪] উপস্ত ম্ভন বা দৃঢ়ীকরণ বীর্যের লক্ষণ। বীর্য দ্বারা দৃঢ়ীকৃত যাবতীয় কুশলধর্মের পরিহানি হয় না।
[*মিলিন্দ প্রশ্ন*, ধর্মাধার মহাস্থবির (কলিকাতা : ১৯৮৭), পৃ. ৩৭]

২০. শ্রীমৎ ধর্মদীপ্তি স্থবির , *বুদ্ধের জীবন ও বাণী* (চট্টগ্রাম : ১৩৯৯), পৃ. ২৮

২১. পঞ্চ ইন্দ্রিয় : রূপ, রস, শব্দ, গন্ধ এবং স্পর্শকে পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলা হয়।

২২. নত্থি রাগসমো অগ্গি, নত্থি দোসসমো গহো, নত্থি মোহসমো জালং, নত্থি তণ্হাসমা নদী। (*ধর্মপদ*, মলবর্গ/২৫১)

২৩. যো চে তং সহতী জম্মিং তণ্হং লোকে দুরচ্চযং,
শোকাতণ্হা পতন্তি উদবিন্দুহব পোক্খরা। (*ধর্মপদ*. তৃষ্ণাবর্গ/৩৩৬)

২৪. *মিলিন্দ প্রশ্ন*, ধর্মাধার মহাস্থবির, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৩-৭৪